সূচিপত্র

প্রথম মূলনীতি : শিশু জন্মের আগে থেকে প্রস্তুতি শুরু করুন ১১

দ্বিতীয় মূলনীতি : উপযুক্ত পারিবারিক পরিবেশ নিশ্চিত করুন ১৮

তৃতীয় মূলনীতি : সুষ্ঠু-সুন্দর সমাজ নির্বাচন ২৬

একটি আদর্শ পরিবারের অপরিহার্য উপাদান ২৮

চতুর্থ মূলনীতি : শেখার পদ্ধতি হোক অংশগ্রহণমূলক ৩৩

যেভাবে শিশুরা প্রাণবন্ত হতে পারে ৩৪

যেসব বিষয়ে শিশুরা সক্রিয় ৩৬

যে কারণে শিশুদের মন ভেঙে যায় ৩৬

পঞ্চম মূলনীতি : শিক্ষার উদ্দেশ্য ভালোভাবে জানা ৩৯

আপনার পারিবারিক অবস্থা কতটুকু উন্নত? ৪০

পরিবারিক প্রতিটি কাজে স্বচ্ছ ধারণা ৪২

সন্তানদের আমরা যেভাবে গড়ে তুলব ৪৪

ষষ্ঠ মূলনীতি : সন্তানের প্রতি মনোযোগী হোন ৪৯

পরিবর্তনশীল পৃথিবী ৪৯

পরিবারের অগ্রগতি কতটুকু হচ্ছে? ৫০

সম্পর্ক হয়ে উঠুক আরো বেশি মজবুত ৫১

সপ্তম মূলনীতি : মধ্যমপন্থা অবলম্বন **৫৪**

মধ্যমপন্থি শিক্ষার উদাহরণ ৫৬

অষ্টম মূলনীতি : মমতার আবরণে আবৃত রাখা **৬২**

মনের কথা শেয়ার করা ৬৩

কথায় ও কাজে মমতার প্রকাশ ৬৪

পুরস্কার ও উৎসাহ প্রদান ৬৫

নবম মূলনীতি : সন্তানের সমস্যা বুঝতে পারা **৬৯**

অতিমাত্রায় ছোটাছুটি ৭০

মিথ্যা বলার প্রবণতা ৭১

ভাইবোনদের মাঝে ঝগড়াবিবাদ ৭২

দশম মূলনীতি : শিখতে হবে নিয়ম-শৃঙ্খলা **৭৬**

শৃঙ্খলা একটি পরিপূরক বিষয় ৭৬

শৃঙ্খলার জন্য পরিকল্পনা ৭৭

শৃঙ্খলায় অবিচল থাকা ৭৮

ন্যূনতম ভদ্রতা সর্বদা থাকতে হবে ৭৯

কেমন হবে কাজের প্রতিফল? ৭৯

একেক বয়সে একেক নিয়ম ৮০

সীমিত পরিসরে কিছু শৃঙ্খলা ৮১

বাচ্চাকে কখনো আঘাত করবেন না ৮১

প্রথম মূলনীতি

শিশু জন্মের আগে থেকে প্রস্তুতি শুরু করুন

ধরুন, কেউ একটা জটিল যন্ত্র কিনল যা সে আগে কখনো ব্যবহার করেনি। সে তখন কী করবে? অবশ্যই যন্ত্রের সাথে থাকা নির্দেশিকাটি পড়ে দেখবে। অথবা যারা আগে যন্ত্রটা ব্যবহার করেছে তাদের থেকে জেনে নেবে। নির্মাতারা প্রায়ই গ্রাহককে যন্ত্রের ব্যাপারে আগে ভালোভাবে জেনে নিতে বলেন যাতে দাম দিয়ে কেনা যন্ত্রটা অজ্ঞতাবশত নষ্ট হয়ে না যায়।

একটি শিশু কিন্তু যেকোনো যন্ত্রের চেয়েও অনেক বেশি জটিল। শিশুর সঠিক লালনপালন ও বিকাশের জন্য তাই প্রয়োজন—জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার যথার্থ ব্যবহার।

কিন্তু অনেকেই এ বিষয়টা স্বীকার করতে চান না। ফলে দেখা যায়, তারা চার-পাঁচটা বাচ্চা জন্ম দিয়ে বসে আছেন, অথচ বাচ্চা মানুষ করা নিয়ে তারা কোনো বই পড়েননি, কোনো বক্তৃতা শোনেননি কিংবা কোনো বিশেষজ্ঞের পরামর্শও নেননি।

এরকম আহম্মকির ফলাফল আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। এমন এক প্রজন্ম এখন বড় হয়ে উঠছে যারা পড়াশোনা ও বাস্তব জীবন দুক্ষেত্রেই ব্যর্থ। তবে আশার কথা হলো, সন্তান-প্রতিপালনের ব্যাপারে মানুষের সচেতনতা বাড়ছে, আগ্রহ বাড়ছে এ-সম্পর্কিত পড়াশোনার প্রতি।

সন্তানের জন্মের আগে থেকেই সন্তান-প্রতিপালনের প্রস্তুতি নিতে হবে। এ প্রস্তুতির পরিসর বড়, কিন্তু অসম্ভব কিছু নয়। প্রয়োজন শুধু লেগে থাকার মানসিকতা।

এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা করা দরকার—

এক.

'শিশু-প্রতিপালনের শিক্ষা'-এর মাধ্যমে আমরা বোঝাতে চেয়েছি, শিশু-প্রতিপালন-সংক্রান্ত সকল তথ্য ও দক্ষতার সমন্বয়। এর ভিত্তিতে বাবা-মা সন্তানদের গড়ে তুলবেন, শিক্ষা দেবেন, ভালো আচরণ শেখাবেন এবং তাদের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবেন। শিশু-প্রতিপালনের গুরুত্ব, তাদের সাথে মেলামেশা করার প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের সাথে সম্পর্কের বন্ধন গড়ে তোলাও এ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

একই সাথে সন্তানকে বড় করে তোলার মূলনীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ ও ত্যাগ কী কী, তা আমাদের বোঝা দরকার। এগুলো এক জায়গা থেকেই আমরা শিখতে পারব এমনটা আশা করা অনুচিত। কারণ, শিশু-প্রতিপালনের পুরো প্রক্রিয়াটি একটি জটিল বিষয়। এটা নির্ভর করে বহুবিধ অভিজ্ঞতা আর প্রায়োগিক তথ্যের ওপর। আবার এ-সংক্রান্ত শিক্ষা উপাদানেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে যেকোনো জটিল কাজই সহজ হয়ে যেতে পারে। তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করেই আমরা এ পথে যাত্রা শুরু করব।

দুই.

শিশু-লালনপালন এক দিকে যেমন আনন্দদায়ক, আবার অন্যদিকে জটিলও বটে। অনেক সময় শত চেষ্টা আর কষ্ট করা সত্ত্বেও সন্তানকে নিয়ে আমাদের আশা পূরণ হয় না। তখন ভীষণ ক্লান্তি আর গ্লানি চেপে বসে, পুরো পথটাকে আরো জটিল থেকে জটিলতর মনে হয়।

এ প্রসঙ্গে চীনা বাঁশগাছের গল্পটা বলা যায়। প্রথম চার বছর চারার শেকড় গভীর থেকে গভীরে যেতে থাকে। কিন্তু বাঁশ মাটির ওপরে তেমন একটা বেড়ে ওঠে না। পরবর্তী বছরে ওপরের দিকে এতটাই বাড়ে যে, পঞ্চম বছরের শেষের দিকে গিয়ে গাছের উচ্চতা দাঁড়ায় প্রায় ৮০ ফুট! শিশু-প্রতিপালনও অনেকটা এমনই। প্রথম

প্রথম আমরা হয়তো আশানুরূপ ফল দেখতে পাব না, কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন দেখতে পাব যে, তারা বদলে গিয়েছে। তাই হতাশ হয়ে কখনোই আমাদের হাল ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

তিন.

আমাদের সমাজ এককালে গ্রামীণ, সহজ-সরল পরিবেশকেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে সেই সমাজে। পরিবর্তনগুলো যেমন অনেক বড় পরিসরের, তেমনি অনেক জটিল। আর এসবের সরাসরি প্রভাব পড়ছে আমাদের সন্তানদের ওপর।

গ্রামীণ পরিবেশে মানুষের মধ্যে সম্পর্কগুলো ছিল অনেক নিবিড়। তারা একে অপরের সাহায্যে দ্রুত এগিয়ে আসত, কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়াত। পুরো সমাজ একটা দেহের মতো ছিল। আত্মীয়, প্রতিবেশী ও বন্ধুর সন্তানদের ব্যাপারেও তাদের দায়িত্ববোধ কাজ করত। কিন্তু সমাজের পরিবর্তনের সাথে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ যোগ হয়ে পরিস্থিতি এখন ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। নিজের সন্তানের ব্যাপারে অন্যের এগিয়ে আসাকে অনেকেই নাক গলানো হিসেবে ধরে নিচ্ছে।

মানুষ এখন অনেক বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক তৃপ্তি লাভে আগ্রহী, অতীতের মতো সামাজিকভাবে সমষ্টিগত আনন্দ ভাগাভাগির ব্যাপার এখন উঠে যাচ্ছে। এভাবে যত সময় যাচ্ছে তত বেশি আমরা নিজেদের আলাদা করে ফেলছি। ফলে আমরা সন্তান-প্রতিপালনে সাহায্য পাচ্ছি না। একাই পুরো বিষয়টি আমাদের সামলাতে হচ্ছে। এর ফলে অবশ্য সন্তান-প্রতিপালনে বাইরের প্রভাবের থেকে পারিবারিক প্রভাব পড়ছে বেশি।

একটি আদর্শ মুসলিম পরিবারই হলো এক্ষেত্রে সমাধান। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, এমন পরিবার গড়ে তুলতে সমাজের সহযোগিতা পাবার সম্ভাবনা খুব কম।

চার.

সভ্যতার পতনের শুরু হয় সামাজিক অবক্ষয়ের হাত ধরে। সামাজিক অবক্ষয় আবার পরিবার ভাঙনের ফল। পরিবার ভাঙনের পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে, এর মধ্যে প্রধান হলো ধর্ম নিয়ে উদাসীনতা ও অজ্ঞতা। এর পরের কারণ হলো

সন্তানদের ব্যাপারে অভিভাবকের নৈতিক দায়িত্ববোধের অভাব। এছাড়া সন্তানের কামনা-বাসনাসহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বাবা-মায়ের হেলাফেলাও এর অন্যতম কারণ।

তাই পরিবারের সংস্কারের মাধ্যমেই কেবল সমাজ সংস্কার করা সম্ভব। ফলে বাঁচবে সমাজ, বাঁচবে সমগ্র উম্মাহ।

পাঁচ.

সন্তান-প্রতিপালনের চ্যালেঞ্জগুলো একেক পরিবারে একেক রকম। এমন অনেক সন্তান আছে যারা তাদের ছোট ভাইবোনদের বড় করার ব্যাপারে বাবা-মায়ের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। তারা আচরণ, বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়ে যেমন এগিয়ে, তেমনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতিও অনুগত। এরকম সন্তান বাবা-মায়ের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার। আবার এমন অনেক সন্তানও আছে যারা পরিবারের অশান্তির মূল কারণ এবং বছরের পর বছর তাদের মাঝে কোনো পরিবর্তন আসে না। এ কারণেই সন্তান-প্রতিপালনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহ লাভে নিরলসভাবে দুআ করে যাওয়া।

একগুঁয়ে বাচ্চাদের বড় করার বিষয়টিকে আমাদের চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে এবং এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের শিশু-প্রতিপালন সম্পর্কে পড়াশোনার পরিধি আরো বিস্তৃত করতে হবে। কোনো বাচ্চা সিজোফ্রেনিয়া কিংবা অনুরূপ কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে আমরা যেমন যত্ন নিয়ে তাদের সুস্থতার জন্য পরিশ্রম করি, জেদি বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও আমাদের তেমনি ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। হতাশাগ্রস্ত হয়ে অভিযোগ করা থেকে দূরে থাকতে হবে। এ ধরনের বিশেষ পরিস্থিতিগুলো আমাদের জন্য পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় আমাদের হেরে যাওয়া চলবে না।

ধরুন, কোনো পরিবারে একটি অলস ছেলে আছে, যে পড়তে বসতে চায় না, পড়াশোনাকে ঘৃণা করে। এক্ষেত্রে পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের কী করা উচিত? এই সমস্যা ও এর সমাধান নিয়ে তারা গভীরভাবে জানার চেষ্টা করবে। তাকে পড়াশোনার ব্যাপারে আগ্রহী করতে সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এমনকি একজন বিশেষজ্ঞের সাথেও তারা এ নিয়ে আলোচনা করে দেখবে। কিন্তু কোনো কিছুতেই কাজ না হলে তার ইচ্ছা মোতাবেক স্কুলের পড়াশোনা বন্ধ করার ব্যাপারে নিতে হবে জোরালো পদক্ষেপ। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সন্তানের জন্য সব ধরনের

পদক্ষেপ কাজে লাগাতে হবে। এর মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়বে এবং তৈরি হবে সমস্যা সমাধানের মানসিকতা। শুরুতেই হাল ছেড়ে দেওয়া বা উদাসীন হয়ে পড়া কখনোই কাম্য নয়।

ছয়.

সন্তান-প্রতিপালনের দায়িত্ব কেবল বাবা-মায়ের নয়, পরিবারের অন্য সদস্যেরও এক্ষেত্রে যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। ধরুন, আপনার বাসায় ৩ ধরনের ছেলেমেয়ে আছে—স্কুলগামী বাচ্চা, কিশোর আর প্রাপ্তবয়স্ক। সাথে স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি এমন বাচ্চাও থাকতে পারে। বাবা-মায়ের বাইরে বড় সন্তানদেরও দায়িত্ব রয়েছে ছোটদের ব্যাপারে। এভাবে অপরের সমস্যা সমাধানে, মূল্যবোধ শিক্ষা এবং ভুল সংশোধনের ব্যাপারে প্রত্যেকেরই দায়িত্ব রয়েছে।

সন্তানের দুর্বলতাগুলো পরিবারের জন্য সন্তান-প্রতিপালন শেখার সুযোগ। উদাহরণস্বরূপ, পরিবারের বাচ্চা মেয়ে কোনো পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ভেঙে পড়েছে। এক্ষেত্রে তাকে সহানুভূতি, সমবেদনা ও আদরের মাধ্যমে বোঝালে পরবর্তী সময়ে সে এ ধরনের সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার সাহস পাবে।

আবার ধরুন, দুই বালকের মাঝে ঝগড়া-মারামারি লেগে গেল। এক্ষেত্রে যে প্রথমে সীমালঙ্ঘন করেছে তাকে যেমন অপরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে বোঝাতে হবে, তেমনি অপরজনকেও উদারভাবে ক্ষমা করা শেখাতে হবে। কিংবা ধরুন, পরিবারে কোনো বাচ্চা কারো সম্পর্কে গিবত করল। এক্ষেত্রে যার সম্পর্কে গিবত করা হয়েছে তার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করার শিক্ষা দিতে হবে তাকে। আবার গিবত করা কত জঘন্য কাজ সে ব্যাপারেও তাকে বোঝাতে হবে। এভাবে প্রতিটি ভঙ্গুর পরিস্থিতিকে আমরা পরিবার ভাঙনের আরেকটি সুযোগ হিসেবে গড়ে উঠতে না দিয়ে বরং পরিবারের বন্ধন মজবুত করার সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে পারি। এর জন্য পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পদ্ধতি জানতে হবে এবং তা সঠিক সময়ে কাজে লাগাতে হবে।

সাত.

আমরা সবাই আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ভাবি, আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো কিছু যাচাই করি, অন্যরাও সেই একই দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছু বিচার

করবে। এটা অনেক বড় একটা ভুল। আল্লাহ যেমন আমাদের চেহারায় বাহ্যিকভাবে ভিন্নতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, একইভাবে মানসিকভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিত্বের মাঝেও পার্থক্য রেখেছেন। আমাদের চেহারাগত ভিন্নতার মাঝে আল্লাহ তাআলা যেমন অসংখ্য উপকার নিহিত রেখেছেন, তেমনি আমাদের যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার মাঝেও কল্যাণ রেখেছেন। এ কারণেই এক বাচ্চার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি কাজ করবে, অন্য বাচ্চার ক্ষেত্রে সে পদ্ধতি কাজ না-ও করতে পারে। আবার এক বাচ্চা যে জিনিসটা পছন্দ করে, দেখা যাবে, অন্য বাচ্চা সেটা ঘৃণা করছে। এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ আমাদের আনাচেকানাচেই পাওয়া যাবে।

আমরা তাই একেক বাচ্চার ক্ষেত্রে একেক পদ্ধতি কাজে লাগাব। এ কাজ বেশ কঠিন হলেও এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। অনেক বাবা-মাই অবাক হয়ে ভাবেন, এক বাচ্চার ক্ষেত্রে এরকম হলে আরেক বাচ্চার ক্ষেত্রে এরকমই হবে না কেন? অথচ বিভিন্ন বাচ্চার ক্ষেত্রে একই নিয়ম খাটবে এমনটা ভাবাই আসলে বোকামি।

আট.

শিশু-লালনপালনের অধুনা পূর্বশর্তগুলো দেখে অনেক বাবা-মাই ভয় পেয়ে যান। সেগুলো অনেক কষ্টকর মনে হয় তাদের কাছে। এ ধরনের আশঙ্কা অমূলক বলে আমরা উড়িয়ে দিচ্ছি না। কারণ, সন্তান-প্রতিপালনের কাজ দিনরাত বিরতিহীনভাবে করে যেতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো একে মাফিয়া যুদ্ধের সাথে তুলনা করলে বাড়াবাড়ি হবে না। এজন্য কয়েকটা বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে হবে—

প্রথমত, সন্তানদের গড়ে তোলার চেষ্টার জন্য আল্লাহ আমাদের পুরস্কৃত করবেন। আমাদের মাধ্যমে যেমন তারা এ পৃথিবীর আলো দেখেছে, তেমনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসার নুর দিয়ে তাদের হৃদয় আলোকিত করা আমাদেরই দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে আমরা তাদের জন্য যদি কষ্ট করি, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই আমাদের আমলনামায় সাওয়াব লিখে রাখবেন এবং আমাদের মৃত্যুর পরও সন্তানদের দুআর মাধ্যমে আমাদের মর্যাদা বাড়াতে থাকবেন। এত পুরস্কার লাভের জন্য দুনিয়ার জীবনে সামান্য কষ্ট তো করাই যায়।

দ্বিতীয়ত, আজ আমরা সন্তানদের জন্য যে ত্যাগ-কুরবানি করছি, এক সময় আমাদের বাবা-মাও একই ত্যাগ করেছেন; আবার আমাদের সন্তানরাও তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একই কাজ করবে। এ এক চলমান আদান-প্রাদানের ধারা।

আমরা সবাই যদি জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, আশা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে এ কাজে শ্রম দিই, তবে অবশ্যই আমরা অনেক কিছু হাসিল করতে পারব। ইনশা আল্লাহ আমরা তা করেই ছাড়ব।